

মাধ্যমিক শিক্ষার মান বাড়াতে হলে ...

শিক্ষা খাতে বাংলাদেশে অর্জন অনেক এবং তা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। আমাদের শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। দেশে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থী পাচ কোটির বেশি। কেবল বিত্তবানরা শিক্ষা পাবে, যার টাকা আছে সেই কেবল শিক্ষার ধাপগুলো একের পর এক অতিক্রম করবে—বিভিন্ন সময়ে এমন ধারণা প্রচারের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে সব সরকারই শিক্ষার দুয়ার সবার জন্য অব্যাহত রাখার ওপর জোর দিয়ে চলেছে। হতদরিদ্র পরিবারের সন্তানরাও পড়তে পারছে। বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়েছে নারী শিক্ষা। শিক্ষার জন্য সবুজের চাহিদা তৈরি হয়েছে এবং তার জোগান নিশ্চিত করায় নানাবিধ চেষ্টা চলছে। শিক্ষা খাতে এ অর্জনের পাশাপাশি আমরা কিছু দুর্বলতাও লক্ষ্য করছি এবং তা চিহ্নিত করতে পারছি। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদে আলোচনায় এ বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। আমরা এটাও লক্ষ্য করছি যে, কতকাজে পরিণত করার চেষ্টা রয়েছে এবং তার প্রতিফলন মাধ্যমিক শিক্ষার মান বাড়াতে প্রণীত ১৫ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের আন্তরিক আগ্রহ। তিনি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠকে গৃহীত সুপারিশগুলো সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন।

এখানে আমি মূলত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা নিয়েই আলোচনা করব। সরকারি বিদ্যালয় ও বেসরকারি বিদ্যালয়—দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। তবে মোট বিদ্যালয়ের ৯৭ শতাংশই বেসরকারি। সরকার থেকে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মীদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়। সরকারি কর্মীদের মতোই নতুন পে স্কেলের সুবিধা তারা পেয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রী সরকারের কাছ থেকে বিনামূল্যে বই পায়। বছরের প্রথম দিনেই নতুন বই সব ছাত্রছাত্রীর হাতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অতীতে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছানোর কাজে বিঘ্ন ঘটেছে। বই নিয়ে যত ব্যবসার চেষ্টা হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ নিয়ে সে তুলনায় নজর কম পড়েছে। শেষ পর্যন্ত সরকার দায় নিয়েছে এবং সফল হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পাচ্ছে। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও সংস্কার, গবেষণাগার ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন, মান্দিমিডিয়া ক্লাস রুম পরিচালনা—এসব ক্ষেত্রেও রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তা।

কিন্তু পাশাপাশি সমস্যাও কম নেই। যতটা সুবিধা সরকার থেকে শিক্ষার প্রসার ও মান বাড়াতে দেওয়া হচ্ছে, তার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে মনোনিয়ন বাণিজ্য চলছে বলে অভিযোগ রয়েছে। যোগ্য শিক্ষকের সমস্যা প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে। ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়েও সমস্যা। সম্প্রতি সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছেন—সংসদ সদস্যরা পদাধিকারবলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে থাকতে পারবেন না। এ দায়িত্ব নিতে চাইলে তাকে নির্বাচিত হতে হবে। তবে এ রায় বাস্তবায়ন হলেও ব্যবস্থাপনা কমিটি সংক্রান্ত সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না। এ নিয়ে যত যত জরিপ-গবেষণা হয়েছে তার প্রায় সবগুলোতেই বলা হয়েছে—শিক্ষার মান বাড়াতে ভূমিকা রাখতে পারে, এমন পরিচালনা কমিটি অনেক প্রতিষ্ঠানেই

সমকালীন প্রসঙ্গ | রাশেদা কে চৌধুরী

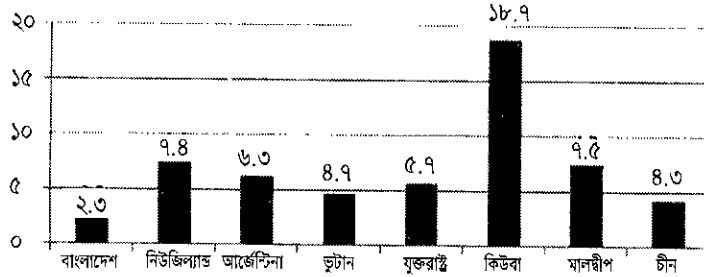


তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক

অনুপস্থিত। এ বিষয়টির প্রতি জরুরি মনোযোগ প্রদানের সময় এসেছে। শিক্ষার মান বাড়াতে অবকাঠামো সুবিধা অপরিহার্য। ব্যবস্থাপনাও ভালো হওয়া চাই। তবে সবকিছুর ওপরে হচ্ছে শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দক্ষতা। শ্রেণিকক্ষের চালিকাশক্তি হচ্ছেন শিক্ষক। এটা স্বীকৃত যে, শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন ধাপে কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন যারা তাদের সবাই শিক্ষকতা পেশায় সমান দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন না। শিক্ষকতায় দক্ষ করে তোলার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন

আমাদের দেশে এমনিতেই ছুটি ও অন্যান্য কারণে পাঠদানের সময় উন্নত বিশ্বের তুলনায় কম। অনেক দেশে বছরে এক হাজার থেকে ১২শ' ঘণ্টা পর্যন্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সরাসরি সংযোগ থাকে। বাংলাদেশে এ সময় ৪০০ ঘণ্টার মতো। বিদ্যালয়গুলোতে দ্বিতীয় শিফট চালু হলে এ সময় আরও কমে যেতে পারে। অনেক কারণে আমাদের বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। যেসব কেন্দ্রে মাধ্যমিক কিংবা অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন হয়, সেখানে

গ্রাফ ৩: বিভিন্ন দেশের বাছুরে শিক্ষার বরাদ্দ (জিডিপি %)*



পাঠ্যবই বয়স ও শ্রেণির উপযোগী করে যেমন প্রণয়ন করতে হবে, তেমনি তার ভাষা হতে হবে প্রাঞ্জল, সুখপাঠ্য ও আকর্ষণীয়। ড. জাফর ইকবাল ও শিক্ষাবিদ ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মতো খ্যাতিমান শিক্ষক ও লেখকরা পাঠ্যবই চূড়ান্ত করার কাজে যুক্ত হলে এ লক্ষ্য অর্জন সহজ হতে পারে। তবে এ কাজে যাদেরই দায়িত্ব প্রদান করা হোক না কেন, তাদের পর্যাপ্ত সময় এবং আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করতে হবে। তিন-চার দিন সময় দিয়ে খসড়া বই চূড়ান্ত করতে বলা অর্থহীন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও সময় ও পারিশ্রমিকের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

প্রশিক্ষণ। আবার প্রশিক্ষণ পেলেই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক তার প্রতিফলন ঘটাতে পারবেন, সেটা নাও হতে পারে। আমাদের ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতও সর্বত্র কাস্কিত পর্যায়ে নেই। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির কারণে প্রতিটি বিদ্যালয়েই ছাত্রছাত্রীদের ভিড়। কিন্তু শিক্ষার্থী যে তুলনায় বাড়ছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষক বাড়ানো যাচ্ছে না। অবকাঠামো সুবিধাতেও সমস্যা থেকে যায়। দেখা যায়, একজন শিক্ষক ৬০-৭০ শিক্ষার্থীকে পড়াচ্ছেন। অনেক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে সব ছাত্রছাত্রীর স্থান সংকুলান হয় না। কেউ কেউ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুই শিফট চালুর সুপারিশ করছেন। কিন্তু তাতে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেবে। দ্বিতীয় শিফটের জন্য নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হবে না। ফলে শিক্ষকদের ওপর চাপ বাড়বে। ক্লাসে পাঠদানের সময়ও কমে আসবে।

পাঠদানে সমস্যা দেখা দেয়। ভোটকেন্দ্র স্থাপিত হলে বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনায় চারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তির মতো বিষয়কে পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এসব বিষয়ে পাঠদান করা হবে, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মূল্যায়নও হবে; কিন্তু বছর শেষে পরীক্ষা নেওয়া হবে না। অনেক প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়, তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে পাঠদানের উপযুক্ত শিক্ষক নেই। চারুকলার শিক্ষক নেই। অথচ শিক্ষার্থীদের জন্য আছে পরীক্ষা। শিক্ষাবিদদের সুপারিশ বাস্তবায়ন হলে ছাত্রছাত্রীদের ওপর চাপ কমবে, তারা অপরিহার্য বিষয়গুলোর প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে পারবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আলোচনায় আমরা এটাও

বলেছি যে, সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হলে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। 'বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে'—এমন কথা বলা যাবে না। আলোচনায় এটাও বলা হয়েছে যে, মন্ত্রণালয় থেকে হঠাৎ করে কোনো নির্দেশনা জারির প্রবণতা থেকে সরে আসতে হবে। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করা বাধ্যতামূলক হতে হবে। আমাদের সুপারিশগুলো মোটা দাগে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে ধরেই করা হয়েছে। শিক্ষানীতিতে বলা আছে যে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে যে আলোচনা হয়েছে তা মূলত নবম ও দশম শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য হবে। পরীক্ষা পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন সব বিষয়ই আলোচনায় এসেছে। বিভিন্ন পাঠ্যবই পর্যালোচনা করে দেখা গেছে প্রচুর অসামঞ্জস্য। কোন শ্রেণিতে কী পাঠদান করতে হবে, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ রয়েছে এবং সেটা কার্যকর করা চাই।

এটাও আলোচনা হয়েছে যে, পাঠ্যবই বয়স ও শ্রেণির উপযোগী করে যেমন প্রণয়ন করতে হবে, তেমনি তার ভাষা হতে হবে প্রাঞ্জল, সুখপাঠ্য ও আকর্ষণীয়। ড. জাফর ইকবাল ও শিক্ষাবিদ ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মতো খ্যাতিমান শিক্ষক ও লেখকরা পাঠ্যবই চূড়ান্ত করার কাজে যুক্ত হলে এ লক্ষ্য অর্জন সহজ হতে পারে। তবে এ কাজে যাদেরই দায়িত্ব প্রদান করা হোক না কেন, তাদের পর্যাপ্ত সময় এবং আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করতে হবে। তিন-চার দিন সময় দিয়ে খসড়া বই চূড়ান্ত করতে বলা অর্থহীন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও সময় ও পারিশ্রমিকের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি কী হবে, সেটাও বড় সমস্যা। আমরা প্রশ্নভাণ্ডার নিয়ে আলোচনা করছি। গাইড বইয়ের অত্যচার থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত রাখার কথা বলেছি। কোচিং ব্যবসায়ের অবসান ঘটানোও আমাদের লক্ষ্য। প্রশ্নভাণ্ডারে কীভাবে প্রশ্ন জমা রাখা হবে, সে জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি অবশ্য উদ্ভাবনও মনোযোগ চাই।

শিক্ষার ব্যয়ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। চলতি অর্থবছরে শিক্ষা খাতে সর্বমোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। এর অর্ধেকের কিছু বেশি ২৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অব্যাহতভাবে বাড়ছে। তবে জিডিপির অনুপাতে এ বরাদ্দ বাড়ছে না। বিশ্ব উন্নয়ন সূচকে দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষা খাতে বরাদ্দে বাংলাদেশ পিছিয়ে। গত ১৪ বছর ধরে এ বরাদ্দ জিডিপির ২ শতাংশের আশপাশে রয়েছে। অথচ এই স্বল্প বরাদ্দ থেকেও বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে অর্জন বিপুল। আমরা যদি এ খাতে বরাদ্দ আন্তর্জাতিক মানে না হোক, দক্ষিণ এশিয়ার মানেও নিয়ে যেতে পারি, তাহলে মান বাড়ানোর চ্যালেঞ্জ জয়ী হওয়া সহজ হয়ে যাবে। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা রয়েছে। এখন প্রয়োজন একের পর এক কার্যকর পদক্ষেপ, যাতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর সব মহল থেকে এমন স্বস্তি প্রকাশ হতে থাকে—পাসের হার যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে শিক্ষার মান। এটা নিশ্চিত করা চাই যে, যারা পড়াশোনা করবে, শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত থাকবে, ভালো ফল করার জন্য সচেষ্ট হবে—তারা উপযুক্ত ফল পাবে। এ জন্য শিক্ষকদের দায়িত্ব সমধিক এবং তাদেরও সেভাবে প্রস্তুত করে তোলা এ সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ।